উত্তরবঙ্গের
মেলা ও উৎসব

সম্পাদনা
রতন বিশ্বাস

পুস্তক

সূচিপত্র

উত্তর দিনাজপুরের মেলা ও উৎসব	ড. বৃন্দাবন ঘোষ	১৩
দক্ষিণ দিনাজপুরের পাল-পার্বণ, পুজো মেলা ও উৎসব	সমিত ঘোষ	৭৭
মালদা জেলার মেলা ও উৎসব	গোপাল লাহা	১১০
জলপাইগুড়ি জেলার মেলা	দীপক কুমার রায়	১৪৫
কোচবিহার জেলার মেলা ও উৎসব	দিলীপ কুমার দে	১৫৪
দার্জিলিং জেলার ধিমাল জনজাতির গারাম পুজো-উৎসব ও মেলা	বিশ্বজিৎ রায়	১৬৭
দার্জিলিং জেলার মেলা ও উৎসব	রতন বিশ্বাস	১৭৭
উত্তরবঙ্গের মুসলমানদের মেলা ও উৎসব	আবদুস সামাদ	১৮৮
উত্তরের আদিবাসী উৎসব	প্রমোদ নাথ	২০২

উত্তর দিনাজপুরের মেলা ও উৎসব

ড. বৃন্দাবন ঘোষ

মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে গেলে প্রয়োজন পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় ও মেলা মেশার। ভাব বিনিময় হল ভাষা এবং মেলা মেশার উপলক্ষ্য হল কোনো অনুষ্ঠান, মেলা বা উৎসব। আদিম কালে অসভ্য বন্য মানুষ যেদিন ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করল, সেইদিনই জন্ম নিল ভাষার। তখন মানুষ ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত এবং জীবন ধারণের জন্য পশু শিকার করত। আর সেই শিকার করা নিহত পশুকে নিয়ে আগুন জ্বেলে নাচগানে মেতে উঠত। কখনো কখনো তারা শিকারে বেরোবার পূর্বে নাচগান করত। মনের কল্পনায় বাস্তব শিকারের দৃশ্যগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে শিকার ও শিকারির অভিনয় করত। অভিনয়ে হরিণের শিং, তার চামড়া ও বাইসনের মাথা প্রভৃতি ব্যবহার করত। পশু শিকার, রথের দৌড়, পাশা খেলা ও নাচগান ছিল আর্যদের প্রধান অনুষ্ঠান। সুতরাং শুধু অবসর বিনোদনের জন্য নয়, নানা আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তারা নাচগান করত।

তারা এই নাচগানের মধ্য দিয়ে অসুখ-বিসুখ সারাত, ভূত-প্রেত তাড়াত, অশুভ শক্তিকে দূর করার চেষ্টা করত, বৃষ্টির দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নাচগান করত।[১] প্রথমদিকে তারা বনের ফলমূল ও পশুর মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। পরবর্তীকালে তারা বনজঙ্গল কেটে জমি তৈরি করে সেই জমিতে ফসল ফলাত। তখন কৃষিজমিতে জলসেচের জন্য কোনো বাঁধ বা জলাশয় থাকায় তাদের বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করতে হত।

বাংলা চিরকাল কৃষি প্রধান অঞ্চল। এই অঞ্চলের মানুষরা অধিকাংশ গ্রামে বাস করত। গ্রামের চারপাশের জমি চষে নানা শস্য ও ফলাদি উৎপাদন করত। এখানকার মতো তখনও প্রধান শস্য ছিল ধান। আর এই ধানের মধ্যে শালি ধানের ভাত খুব উপকারী ও সুস্বাদু ছিল। চক্রপানি তাঁর রসায়ন অধিকার গ্রন্থে লিখেছেন—প্রথমে দুধভাত খেতে হবে এবং তারপরে সিদ্ধ করা ঝরঝরে শালি ধানের ভাত খেতে হবে। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশম গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে মেয়েরা ইক্ষুবনের ছায়ায় বসে শালিধান পাহারা দিত। সেই সময় বাংলায় ইক্ষুচাষ হত। ইক্ষু রস হতে প্রচুর গুড় ও চিনি প্রস্তুত হত এবং তা বিদেশে পাঠানো হত। তখন এই এলাকাতেও প্রচুর গুড় প্রস্তুত

হত। তাই এই এলাকাটি গৌড় বলে পরিচিত ছিল। তাছাড়া তুলা, সরষে, নারকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, কলা, লেবু চাষও রীতিমতো হত।[২] ভারতীয় অধিবাসীরা অন্যান্য দেশের অনেক অধিবাসীদের মতো এসব ফলমূল ও গাছের পুজো করত। তারা পাহাড়, পাথর ও বিশেষ স্থানের উপর দেবত্ব আরোপ করে পুজো করত।

মাঠে হল চালনার প্রথম দিনে, বীজ ছড়াবার, ধান বুনবার ও কাটবার আগে নানা প্রকার আচার অনুষ্ঠান বাংলার বহু স্থানে আজও করা হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান বিচিত্র শিল্প সুষমায় এবং জীবনের সুষম আনন্দে মণ্ডিত। শুধু কৃষিজীবনকে কেন্দ্র করে নয়, শিল্পীজীবনে দেখা যায়, বিশেষ করে কামারের হাঁপর, কুমোরের চাক, তাঁতির তাঁত, চাষির লাঙ্গল, ছুতোর, রাজমিস্ত্রীর কারুকার্য প্রভৃতিকে আশ্রয় করে এক ধরনের ধর্মাকর্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে।[৩] সাধারণত এসব অনুষ্ঠানে কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে এসব অনুষ্ঠানের অধিকারী।

বাংলার ঘরে ঘরে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে। তেরো শব্দটি তেরো সংখ্যা বুঝিয়েছে, তা নয়, এখানে তেরো শব্দের অর্থ বহু। প্রাচীন পুরাণগুলিতে পার্বণ শব্দের উল্লেখ আছে। এতে পালনীয় আচার থাকে। বাংলার নারী পুরুষ সারা বছর বহু পার্বণ পালন করে থাকে। ঘরে ঘরে পাল-পার্বণ মুখরিত থাকে। পাল-পার্বণের অভিধানগত অর্থ বিশেষ তিথিতে পালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যা ব্যক্তি বা পরিবার পালন করে থাকে। এই পাল-পার্বণ যখন ব্যক্তি বা পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করে আমজনতার আনন্দ প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠে, তখন তা উৎসবের রূপ নেয়। ধীরে ধীরে দুর্গা পার্বণ দুর্গোৎসবে পরিণত হয়।[৪]

পূজা-পার্বণকে ঘিরেই মেলার জন্ম হয়ে থাকে। মেলা শব্দটির উৎপত্তি মিল ধাতু থেকে। মিল ধাতুর সঙ্গে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে মেলা শব্দটির উৎপত্তি হয়ে থাকে—যেখানে কোনো পূজা বা মহোৎসবাদির উপলক্ষ্যে বহু মানুষজনের মিলন ঘটে। গবেষকরা বলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন মেলা হরিদ্বারের মেলা। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকে ফ্রান্সে এবং অষ্টম শতকে ইংল্যান্ডে মেলা বসত। বাঙালি উৎসবমুখর জাতি, যার পরিচয় ঘটে বিভিন্ন পুজো, পার্বণ ও মেলাগুলির মধ্যে। বিশেষ করে গ্রামীণ মেলাগুলি। এসব মেলা ধর্মীয় ও ধর্ম নিরপেক্ষ। ধর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্থানে বহু বছর ধরে ধর্মীয় মেলাগুলি এবং ধর্ম নিরপেক্ষ মেলাগুলি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষ্টির গুরুত্ব বিচার করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মানুষ তার দিনযাপন ও প্রাণ ধারণের জন্য যেসব রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, প্রথা ও কৃত্য মেনে চলে, যেসব খাদ্যদ্রব্য, বেশভূষা ব্যবহার করে, যেসব ভাব ভাবনা সংস্কার বিশ্বাস করে, যেসব গান গায়, ছবি আঁকে, যেসব নাচে গানে বাজনায় খেলাধুলায় মেতে ওঠে, উৎসব পার্বণ উদ্‌যাপন করে, পুজো আজও করে, যেসব হাতের কাজ করে, সাহিত্য রচনা করে, শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য নির্মাণ করে, সেগুলির সম্মিলিত রূপই সংস্কৃতি।[৫]

সংস্কৃতি কতকগুলি বস্তুগত ও ভাবগত উপাদানের একটি সমূহ বিশেষ। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপর, গয়নাগাটি হল বস্তুগত সংস্কৃতি। আর অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, পারলৌকিক কর্ম, দেবতার নামে বারব্রত উপোস, কৃচ্ছ সাধনা, পূজার্চনা, নৈবেদ্য, মেলা, সাহিত্য, নাচ, গান, বাজনা ভাবগত সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি মানুষের সৃষ্টি। মানুষ ছাড়া তার অস্তিত্ব ভাবা যায় না। এক এক স্থানে এক এক শ্রেণির মানুষের বাস। স্থান ভেদেও মানুষ, গোষ্ঠী ভেদেও মানুষ, ধর্ম ভেদেও মানুষ এবং জলবায়ু ভেদেও মানুষ এক একটি বৃত্ত গড়ে তুলেছে। এক এক বৃত্তের অর্থাৎ এক এক জেলার মানুষের দিনযাপন প্রাণধারণ, ভাবনাচিন্তা এক এক রকম। কোচবিহারের যেমন ভাবে থাকে, পুরুলিয়ার মানুষ তেমন ভাবে থাকে না। তবে একই জেলার বিভিন্ন স্থানের পালনীয় পার্বণগুলি সংহত অবস্থায় থাকে। কিন্তু জেলার উৎসবগুলিতে জাতীয় বা আন্তর্জাতিকতার ছাপ থাকে। সেদিকেই লক্ষ্য রেখে এই নিবন্ধে উত্তর দিনাজপুর জেলার পূজা, পার্বণ ও মেলাগুলির আলোচনা তুলে ধরা হল।

অতীতে উত্তর দিনাজপুর জেলা পুন্ড্রদেশের বরেন্দ্রের অন্তর্গত ছিল। তখন এই পুন্ড্রদেশের অধীনে বরেন্দ্র, গৌড়, নীবীতি, সুহ্ম (রাঢ়), ঝাড়খণ্ড, বরাহভূমি ও বর্ধমান অবস্থিত ছিল। এদের মধ্যে বরেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গের একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ। সুলতানি যুগে একমাত্র বরেন্দ্রের ভাতুরিয়ার হিন্দু রাজা গণেশ দনুজমর্দনদেব উপাধি নিয়ে বাংলায় কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন। এই দনুজ থেকে দিনাজপুর নামের সৃষ্টি হয়। বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তরে দার্জিলিং জেলা, দক্ষিণে মালদহ জেলা, পূর্বে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা এবং পশ্চিমে বিহার রাজ্য ও মালদহ জেলা। এই জেলা চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও ইটাহার নামের নয়টি থানা নিয়ে গঠিত। জেলার নয়টি থানা, নিরানব্বইটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পনেরোশো ষোলোটি মৌজা রয়েছে। এই জেলা ৩১৪০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত।

এই জেলায় মহানন্দা, নাগর, টাঙ্গন, কুলিক, ডাউক, সুদানী, শ্রীমতী, গামারী, কাহালই, নোনা, বেরহজ, রতুয়া, রোহিতা, ভাতা, সেরয়ানী, বালিয়া, পিতানু, কুর্তা, বিনা, বালাকর, গান্ধার, সুই, কাঞ্চন, দোলঞ্চা, ব্যারাং নদী রয়েছে। আজ এরা অনেকে লুপ্তপ্রায়। একদা এদের তীরে জমিদার, রাজা, মহারাজারা বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বহু দিঘি, সড়ক, দুর্গ, মূর্তি, মঠ, মন্দির, মসজিদ, দরগা, কাছারিবাড়ি, জমিদারবাড়ি ও রাজবাড়ি গড়ে ওঠে। জেলার ধর্মপ্রাণ মানুষরাও মঠ মন্দির মসজিদ গঠনে এগিয়ে আসেন। কালের করাল গ্রাসে ও অযত্নে অবহেলায় জরাজীর্ণ রূপ নিলেও এদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, মহিমা মন ও নয়নযুগলকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে থাকে। বিশেষ করে কালো পাথরের প্রাচীন যুগের দেবদেবীর মূর্তিগুলি। এই জেলার বহু মন্দিরে ভক্তি সহকারে আজও তারা পূজিত হয়ে থাকে।

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এই জেলার জনসংখ্যা ২৪,৪১,৭৯৪ জন। তার মধ্যে হিন্দু ১২,৬৩,০০১ জন, মুসলিম ১১,৬৫,৫০৩ জন, খ্রিস্টান ৩১,১৭২ জন, শিখ ২৫২ জন, বৌদ্ধ ৩৩৫ জন, জৈন ১৪০ জন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ ১,০৩৬ জন।[৬] এরা পাশাপাশি বসবাস করে আপন আপন অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর পুজো এবং আচার আচরণ পালন করে থাকে।

আজ থেকে ১৪১৮ বছর পূর্বে অর্থাৎ ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গাব্দের সূচনা। তখন বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সমাচারদেব নামে একজন শক্তিশালী রাজা। তাঁর আমলে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। তাঁর উদ্যোগে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য যথেষ্ট প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ১ বৈশাখ নববর্ষের প্রথম দিন। তাই কয়েক বছর থেকে মানুষ এই দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করে থাকে। এই জেলার ব্যবসায়ীরা পূর্বের মতো আজও হালখাতার আয়োজন করে থাকে। জমিদারি আমলে এই জেলার মারনাইয়ের জমিদাররা তাঁদের কাছারিবাড়িতে প্রতি বছর ১ বৈশাখ পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তাঁরা এই দিনে সকালবেলায় হাতিতে চড়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতেন। হাতিগুলিকে বিশেষ সাজে সজ্জিত করা হত। প্রজারা সেদিন জমিদারকে কর প্রদান করত। সেখানে প্রজাদের বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থা করা হত। জমিদার বাড়ির বধূরা অন্দরমহল থেকে তা দেখত।[৭]

পূর্ণিয়ার রাজা পি সি লালেরও এই জেলায় জমিদারি ছিল। এই জমিদারি তদারকির জন্য করণদিঘির পাড়ে একটি কাছারিবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে ১ বৈশাখ তাঁর উদ্যোগে শুরু হয় করণদিঘির স্নান ও শিরুয়া মেলা। করণদিঘি গ্রামের পূর্বপ্রান্তে এই দিঘি অবস্থিত। কথিত আছে নাকি, এই দিঘিতে অঙ্গাধিপতি কর্ণ তর্পণ করেছিলেন। তাঁরই নাম অনুসারে এই দিঘি কর্ণদিঘি বা করণদিঘি নামে পরিচিতি লাভ করে। আর এই দিঘির নাম অনুসারে গ্রামের নাম হয় করণদিঘি। প্রতি বছর ১ বৈশাখ করণদিঘির জলে হাজার হাজার মানুষ স্নান করে। কারণ এই দিঘি অনেকের মনস্কামনা পূর্ণ করে থাকে। বিশেষ করে এই দিঘিতে মানত করে বহু হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করে। তাই আজও অনেকে তার কাছে মানত করে থাকে। নববর্ষের দিনে বহু পুণ্যার্থী এই দিঘিতে স্নান করে তার জলে মানত বস্তু অর্পণ করে। সেই সময় বহু মানুষ দিঘির জলে নেমে উৎসর্গীকৃত প্রাণী ও বস্তুকে সংগ্রহ করার কড়াকাড়ি শুরু করে। তার ফলে বহু উৎসর্গীকৃত প্রাণী তার প্রাণ হারায়। এই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য দীঘির চারপাশে বহু লোক জড়ো হয়। এই সময় দর্শনার্থীরা রং খেলায় মেতে উঠত। অনেকে কাদা মাখামাখি করত। এই ঘটনাকে ছিরুয়া বলা হয়। তাই এই মেলা শিরুয়া মেলা বলে পরিচিত।

এই মেলা জেলার বড়ো মেলাগুলির মধ্যে একটি অন্যতম মেলা। মেলাতে বহু দোকানপাট আসে এবং সারিবদ্ধভাবে বসে। এক এক সারিতে এক এক ধরনের দোকান বসে। কোনো সারিতে জামা কাপড়ের, কোনো সারিতে ফলমূলের, কোনো সারিতে

মিষ্টির, কোনো সারিতে বাঁশের কুলো ডালি মোড়ার, কোনো সারিতে চুড়ি ফিতের, কোনো সারিতে মাটির তৈরি খেলনার, কোনো সারিতে দরজা জানলার, কোনো সারিতে চেয়ার টেবিলের, কোন সারিতে হাঁড়িকুড়ির, কোন সারিতে টিনের বাক্সের, কোন সারিতে ছাতার, আবার কোন সারিতে পান বিড়ি সিগারেটের দোকান বসে থাকে। চিত্ত বিনোদনের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিকও থাকে। খাবারের হোটেলও থাকে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন মেলায় দোকানপাট সাজিয়ে বসে। দুপুরের দিকে এই মেলায় হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য মেলায় পুলিশি ব্যবস্থা থাকে। এই মেলায় কেউ আসে পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশে, কেউবা আসে আপন পণ্য সংগ্রহের উদ্দেশে। মেলা সাতদিন ধরে চলে। তবে প্রথম দিনে মেলায় সবচেয়ে ভিড় থাকে বেশি। তবে বিজ্ঞান মনস্কতার জন্য দিনে দিনে স্নানার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অনেকের ইচ্ছা থাকলেও সাংসারিক চাপের জন্য মেলায় আসতে পারে না।

ইসলামপুর মহকুমার অন্তর্গত করণদিঘি থানার রানিগঞ্জ অঞ্চলে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের উত্তর দিকে চার কিলোমিটার দুরে অবস্থিত সুরতা দিঘি। কেউ কেউ সুরতাকে সরিতা বলে থাকে। সরিতা শব্দটি সরিৎ শব্দ থেকে এসেছে। সরিৎ শব্দের অর্থ নদী। আর এই নদী হল সুদানী নদী। এই দিঘি আশি বিঘে জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। তার পূর্ব ও দক্ষিণদিকে কিছু জলাভূমি রয়েছে। দক্ষিণদিকের জলাভূমি থেকে একটি বিস্তৃত নালা সুদানী নদীতে গিয়ে পড়েছে। এই দিঘির সঙ্গে দেড় কিলোমিটার দুরের জালালদিঘির সম্পর্ক রয়েছে। কথিত আছে নাকি, মাছ ধরার সময় এই দিঘির জল ঘোলা হলে জালালদিঘির জলও ঘোলা হয়ে যেত। বর্তমানে সুরতা দিঘির গভীরতা নেহাত কম নয়। তবে তার উঁচু পাড় নীচু হয়ে গেছে। সম্বৎসর জল থাকে। তার জলে প্রচুর রুই কাতলা মাছ জন্মে। এই দিঘির কালো জল বড়ো মনোরম।

সেই জলে পায়রা, ডিম, ছাগল, বাছুর, কলা, বাতাসা, সোনা-রুপোর অলংকার উৎসর্গ করলে বন্ধ্যা নারী সন্তান সম্ভাবা হয়। শরীরের ঘা চুলকানি সেরে যায় এবং সংসারে সুখ শান্তি বিরাজ করে। তাই এই অঞ্চলের পিপলা, আমলাবাড়ি, কালীবাড়ি, বাগিন্দর, ভৈষলুঠি, চাঁদগোলা, জিয়াগাছি, সীমানপুর, জগদীশপুর, জালালপুর, সাহাপুর, বাগিলা; এমনকি চাকুলিয়া থানার কিছু গ্রামের মানুষ দল বেঁধে এসে নববর্ষের দিনে এই দিঘিতে স্নান করে। বহু দিন থেকে তারা স্নান করতে আসে। স্নানার্থীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। স্নান সেরে কেউ কেউ দিঘির পাড়ে বসে থাকা সাধু-সন্তদের চাল ও টাকা পয়সা দান করে। এরপর তারা সোজা চলে যায় দিঘির দক্ষিণপাড়ে অবস্থিত পীর মজলিস গাজির মাজারে আশীর্বাদ লাভের জন্য। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ সিন্নী দিয়ে পুজো দেয়।

সুরতাদিঘির এই স্নানকে উপলক্ষ্য করে প্রতি বছর ১ বৈশাখ সুরতাদিঘির পাড়ে একদিনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সুরতা গ্রামের মানুষজন এই মেলার আয়োজক।